রবীন্দ্র শিক্ষা চিন্তা ও দর্শন

তিনদিন ব্যাপী সেমিনারের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

সত্যমেব জয়তে

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৫/৩, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড,
কলকাতা-৭০০ ০১৯

গত ১৫ থেকে ১৭ই জানুয়ারী ১৯৯৮ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে রবীন্দ্র শিক্ষা চিন্তা ও দর্শন সংক্রান্ত একটি তিনদিন ব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারটির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল যথাক্রমে রাষ্ট্রীয় অধ্যাপক শিক্ষা পরিষদ, নিউদিল্লী এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেমিনারটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সর্বতঃভাবে সহযোগিতা করেন। এই সেমিনারের প্রতিবেদন দেশে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তবে এ ব্যাপারে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা "মুক্তকণ্ঠ" বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। কেন না এই সেমিনার নিয়ে আহমদ রফিকের একটি রচনা প্রকাশ করার মাধ্যমে "মুক্তকণ্ঠ" পত্রিকার সম্পাদক এক বিশাল সংখ্যক পাঠককে রবীন্দ্র শিক্ষা চিন্তা ও দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করার সুযোগ করে দেন। এই দৃষ্টিকোন থেকে আহমদ রফিকের লেখাটি বিশেষভাবে মূল্যবান। তাই রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ ঐ লেখাটিকে এবার বাংলার সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সমাজের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে। কারণ যে সমস্ত আগ্রহীজন এই সেমিনারে উপস্থিত থাকতে পারেন নি, তাঁরা আহমদ রফিকের লেখাটি পড়ে রবীন্দ্র শিক্ষা চিন্তা ও দর্শন বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিদের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা সম্বন্ধে আলোকিত হতে পারবেন।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জোড়াসাঁকো রবীন্দ্রভারতীতে

রবীন্দ্র-শিক্ষা চিন্তা বিষয়ক সেমিনার

আহমদ রফিক

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি—বর্তমান রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, এখানেই উদয়শংকর হলে শীত-বসন্তের আমেজ নিয়ে অনুষ্ঠিত হল তিনদিন ব্যাপী সেমিনার, সঙ্গে নাচ গান নাটক। জানুয়ারির ১৫, ১৬ ১৭ (১৯৯৮) তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারের বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষাদর্শন। উদ্যোক্তা দিল্লির জাতীয় শিক্ষক, শিক্ষা পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ—সহযোগিতায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যপুষ্ট বলেই বোধহয় আতিথেয়তায় রাজকীয় চরিত্রের কিছু না কিছু আভাস ছিল। প্রমাণ পাওয়া গেল গ্রেট ইস্টার্নে থাকার ব্যবস্থায় এবং বাঙলাদেশ বিমানের মাত্র সাত ঘণ্টা বিলম্বিত যাত্রা সত্ত্বেও দমদম বিমানবন্দরে অভ্যর্থনাকারীদের সহিষ্ণু উপস্থিতিতে। গ্রেট ইস্টার্নের 'গ্রেটনেস' নিয়ে যদিও বর্তমানে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে তবুও তার স্থাপত্যগাম্ভীর্য এখনও মর্যাদাব্যঞ্জক। তাছাড়াও রবীন্দ্রনাথের রচনায় উল্লিখিত গ্রেট ইস্টার্ন এবং থ্যাকারের দোকানে হরদম বই কিনতে যাওয়া-আসার রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্য রীতিমতো ইতিহাসগন্ধী। কৌতুহলী মন চোখ মেলে ধরে আশপাশে।

জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রভারতী প্রাঙ্গণ এখনও নানা কারণে আকর্ষণীয়। মূল ঠাকুর বাড়ির আশপাশে এলোমেলো ভবন ওঠা সত্ত্বেও অতীতগন্ধ এখনও মনে-মননে হানা দিতে সক্ষম। নানা ঘটনার সাক্ষী স্মৃতিবাহী প্রকোষ্ঠ, বিচিত্রাভবন বা দক্ষিণের বারান্দা রবীন্দ্রানুরাগীর জন্য নস্টালজিয়ার কারণ হতে পারে। অবশ্য যারা সেখানকার নিত্যদিনের কর্মী তাদের কথা আলাদা। দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন দিয়ে ঠাকুর বাড়িতে পৌঁছাতে গিয়ে কথাটা বারবার মনে হয়েছে—প্রিন্স দ্বারকানাথের মতো বিত্ত-বৈভব সম্পন্ন রাজকীয়

মেজাজের দিল-দরিয়া মানুষ এমন সংকীর্ণ গলিপথ সহ্য করতেন কেমন করে, এমনকি তখনকার পরিবেশও। আর কাউকে জিজ্ঞাসা করে পাত্তা পাওয়া গেল না জোড়াসাঁকোর নামের উৎস! ছিল কি পারাপারের সহায় কোনও সাঁকোর জোড়?

অনুষ্ঠানের বর্ণচ্ছটার সঙ্গে বেশ মানানসই মনে হয়েছিল কোরা ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি ও শালে সজ্জিত অপেক্ষমাণ ব্যক্তিটিকে, মুখে অভ্যর্থনার আলতো হাসি। অনুষ্ঠানের সেই মূল ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক-শিক্ষা কাউন্সিলের পরিচালক ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়কে চিনিয়ে দিতে হয় নি। খুবই চৌকস, কর্মতৎপর ব্যক্তি। অন্যদিকে রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য ডঃ শুভংকর চক্রবর্তীর মুখে ছড়ানো স্নিগ্ধ বিনয়। অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বাহ্নে সবাইকে নিয়ে গেলেন ঠাকুরবাড়িতে, যে কক্ষে রবীন্দ্রনাথের আগমন এবং বিদায়-একরাশ ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পালা শেষ হলে সূচনা সংগীত ও অতিথি বরণের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরু। একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো যে কমবেশি প্রায় সবার মধ্যে বাঙলাদেশ সম্পর্কে এক ধরনের আবেগ কাজ করে। উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সুপরিকল্পিত এবং উপাচার্যের স্বাগতভাষণ বা উদ্বোধন, পরিচালকের পক্ষ থেকে সেমিনারের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা বা প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের ভাষণ সবই ছিল সংক্ষিপ্ত। মন্ত্রী প্রসঙ্গত জীবনমুখী ও গণমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে যথারীতি রবীন্দ্রচিন্তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছেন।

এ অধিবেশনে মূল বক্তব্য রাখেন ঠাকুর পরিবারের দূরতর সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুর, যিনি শান্তিনিকেতন পাঠভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। সেমিনারের প্রতিটি অধিবেশনেই তিনি সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেছেন।

রবীন্দ্রভারতীতে অনুষ্ঠিত তিন দিনের এ সেমিনারে নির্ধারিত বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন এবং বক্তৃতা দিয়েছেন বহুসংখ্যক লেখক, অধ্যাপক, প্রশাসক ও টেকনোক্র্যাট। পশ্চিমবঙ্গের একাধিক

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অতিথি বক্তা ও প্রবন্ধকার এসেছেন, এসেছেন এ রাজ্যের বাইরে আসাম, ওড়িষা, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য থেকে। দিল্লির সংশ্লিষ্ট প্রশাসন থেকেও এসেছেন কয়েকজন। এছাড়া কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পশ্চিমবঙ্গ বাঙলা আকাদেমি'র মতো একাধিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বও দেখা গেছে। এমনকি ছিলেন লরেটো'র অধ্যক্ষ মিস্টার সিরিল। দেশের বাইরে আমন্ত্রিতদের মধ্যে বাঙলাদেশের রবীন্দ্রচর্চাকেন্দ্র থেকে ছিলেন আহমদ রফিক, ডঃ রফিকউল্লাহ্ খান ও অধ্যাপক মনসুর মুসা, ছিলেন বাঙলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। অনিবার্য কারণে দুই লণ্ডনবাসী অতিথি পৌঁছতে পারেন নি।

প্রবীণ, মধ্যবয়সী, ও নবীনদের বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে নানামতের প্রকাশ ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের চোখে প্রাচীন ভারতের তপোবন শিক্ষা, গুরুবাদী আশ্রমিক শিক্ষার আদর্শ নিয়ে তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক আলোচনাও ছিল মুখ্য বিষয় বা প্রধান সুর। এর বাইরে ভিন্ন সুরও ছিল। প্রবীণ অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় বেশ সরসভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের 'গুরুদেব' হয়ে ওঠার বিরুদ্ধেই কথা বলেন। পাশাপাশি অবশ্য ইতিবাচক দিকগুলোও তুলে ধরেন। তার মত চাপিয়ে দেওয়া হলেও 'গুরুদেব চর্চা' থেকে কবির মুক্ত হতে পারা দরকার ছিল। বয়সের ভার সত্ত্বেও এ সেক্যুলার মানুষটিকে চিন্তার দিক থেকে খুবই স্বচ্ছ মনে হল।

ঠিক এভাবে না হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ 'রবীন্দ্র-ভাবনায় শিক্ষাদর্শন' নামীয় তার দীর্ঘ প্রবন্ধের কথা ঠিকই এনেছেন। বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন ভারতমুখিতার অতিশয্য ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের' কথাটা অবশ্য পর্বান্তরে তাঁর গণমুখী শিক্ষাভাবনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা তাঁর পল্লীচিন্তা থেকে উদ্ভূত এবং সেখানে লোকায়ত জীবন

প্রেরণারূপে উপস্থিত।' এ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ ছিল। রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত অবশ্য শিক্ষাচিন্তার তাত্ত্বিক ও বাস্তব দিকগুলো বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের শ্রী দেবব্রত পালিত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার বাস্তব রূপের ধারাবাহিক ইতিহাস সমস্যাদিসহ তুলে ধরেন। অন্যদিকে ঐ প্রতিষ্ঠানেরই ডঃ মঞ্জুনা বসু তার আলোচনায় তপোবন শিক্ষার আদর্শগত দিকটি নিয়ে আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

বাংলাদেশ থেকে উপস্থিত চারজনই লিখিত প্রবন্ধ পড়েছেন। ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের 'রবীন্দ্রশিক্ষা দর্শন : প্রেক্ষাপট' প্রবন্ধে কবির শিক্ষাচিন্তার একটি বিশ্লেষণধর্মী পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে আহমদ রফিকের প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় নিহিত দ্বন্দ্ব ও সমস্যা'য় মূলত শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দুই বিপরীত অবস্থান—প্রাচীন ভারতীয় তপোবন শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে অধ্যাত্মশিক্ষার মৌল দ্বন্দ্বগুলো প্রয়োগিক সমস্যা হিসাবে আলোচিত হয়েছে। ডঃ রফিকউল্লাহ খানের বিষয় ছিল 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা : রূপ রূপান্তর' যেখানে রবীন্দ্রশিক্ষা ভাবনার একটা মূল্যায়নধর্মী ধারাবাহিক পরিচয় ও পরিণত রূপের কথা বলা হয়েছে। অধ্যাপক মনসুর মুসার বক্তব্য ছিল ভাষাতত্ত্বের রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে।

বাঙলাভাষী কয়েকজন অধ্যাপক অবশ্য ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রবন্ধ পড়েন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য মর্মর মুখোপাধ্যায় ও পবিত্র সরকার। দুজনেই অধ্যাপক। তবে মর্মর কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষা ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো এবং বহু বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ ব্যুরো টেকনোক্র্যাট। অধ্যাপক পবিত্র সরকার বহুপরিচিত ভাষাতাত্ত্বিক এবং রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য। মর্মর মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ আলোচনার অবশেষ বক্তব্য হল রবীন্দ্রনাথের পরিণত শিক্ষাচিন্তা এবং বিশেষ করে শিক্ষার মাধ্যমে সত্যিকার

মানুষ গড়ে তোলার ধারণা অতীতের বিষয়ই নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যও সত্য, সমস্যাটা হল তত্ত্বের প্রয়োগগত সঠিক পদ্ধতি তথা 'মেথডোলজি' উদ্ভাবন এবং এটাই এ যুগের সুধী শিক্ষাবিদগণের প্রধান করণীয় বিষয়। শুধু স্বদেশের জন্য নয় গোটা বিশ্বের পটভূমিতেও এটা সত্য। শেষ কথাটা মিস্টার সিরিলও বলেছেন একটু ভিন্ন ভাষায়।

অধ্যাপক পবিত্র সরকার ভাষাতত্ত্বের দিক নিয়ে কথা বললেও প্রধানত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার সামাজিক গুরুত্ব ও তার ব্যবহারিক সমস্যার দিক নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রোতাদের মধ্যে মৃদু গুনগুনানি ছিল : 'পবিত্রবাবু কেন ইংরাজিতে প্রবন্ধ পড়লেন।' তার দিক থেকে যুক্তি জনা কয় অবাঙালি শ্রোতার জন্য বোধগম্য মাধ্যমের ব্যবহার। তাছাড়া কেন্দ্রীয় উদ্যোক্তা প্রতিনিধির উপস্থিতিও বিচার্য, যিনি বাঙলা বোঝেন না।

প্রসঙ্গত একটা কথা স্বীকার করতে হয় যে পশ্চিমবঙ্গের সারস্বত সমাজ হিন্দি-প্রধান কেন্দ্রীয় শাসকদের দিকে তাকিয়ে বোধহয় সংস্কৃতি অঙ্গনেও ইংরেজির দিকে হাত বাড়িয়ে থাকেন। এ জন্যই হয়তোবা এ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র লেখা হয়েছে ইংরেজিতে, স্মরণিকাও ইংরেজিতে, যদিও শেষোক্তটি অন্তত সর্বভাষীর সুবিধার জন্য ইংরেজিতে ও বাঙলায় হতে পারত। আর বাঙালি লেখক-অধ্যাপকদের কাছে পাঠানো চিঠির ভাষা অবশ্যই হওয়া দরকার ছিল বাঙলা, অবাঙালিদের ক্ষেত্রে ইংরেজি। বলাবাহুল্য বাঙলাদেশের শিক্ষিত শ্রেণীর একাংশ, বোধহয় বড়সড় অংশেরই মানসিকতা একই রকম।

সেমিনারে অবাঙালি আলোচকদের মধ্যে ছিলেন গুজরাতি অধ্যাপক শ্রী প্যাটেল। মূলত গুজরাতে গান্ধীবাদী শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিত এবং এর জনমুখী গুরুত্ব নিয়েই ছিল তার আলোচনা, সেই সঙ্গে রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তার উল্লেখ।

তার বক্তব্য রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তার প্রাসঙ্গিকতায় খুব একটা সারবান ছিল

না, ছিল না রবীন্দ্রশিক্ষাচিন্তার নতুন কোনও দিক-নিরিখ। আসামের প্রবীণ অধ্যাপক লেখক বনকান্ত বরুয়া ইংরেজি বাঙলা মিশিয়ে বেশ সরসভাবেই তার বক্তব্য রাখেন, কিছু উদাহরণ সহ। ওড়িয়া অধ্যাপক বিকে মহাপাত্রা শ্রোতাদের অনুমতি চেয়ে নিয়ে ওড়িয়া ভাষায় তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন যা বুঝতে বড় একটা কষ্ট হয় নি। বরং অনেকের কাছে ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্যে উপভোগ্য মনে হয়েছে, বিশেষ করে হয়েছে বাঙলার সঙ্গে ওড়িয়া ভাষার সমধর্মিতার কারণে। ত্রিপুরার প্রতিনিধি স্থানিক ভাষাতেই প্রবন্ধ পড়েন, তবে সেখানে শিক্ষাদর্শনের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরাদর্শনই ছিল মুখ্য বিষয়। শেষদিনে উপস্থাপিত প্রবন্ধের মধ্যে অধ্যাপক দেবদাস জোয়ারদারের প্রবন্ধটি ছিল ভিন্ন চরিত্রের। শেষপর্যন্ত বক্তা উপস্থাপকের সংখ্যা এতটাই বেড়ে যায় যে সবার জন্য জায়গা করে দিতে গিয়ে বাকিদের সংক্ষেপিত বক্তব্য পেশ করতে বলা হয়। একজন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি তো সেজন্য রাগ করে চলে গেলেন, আরেক অধ্যাপক প্রবন্ধ পড়তে রাজি হচ্ছিলেন না। আসলে সময়ের নিয়ন্ত্রণটা দরকার ছিল গোড়া থেকে। কিন্তু সমন্বয়কের সেদিকে নজর ছিল না। শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু'একজন তাত্ত্বিক তাৎক্ষণিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে অপ্রয়োজনে দীর্ঘ সময় নিয়ে নেন, বিশেষ কারণে তাদের একজনকে সম্বৃত করার চেষ্টা হয় নি। শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পারলেও তিনি সময় হরণ করেছেন ঠিকই। তবে কিছুটা দীর্ঘ হলেও যাজিকা সিস্টার সিরিলের বক্তৃতা ছিল মনোযোগ আকর্ষণের মতো। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে তার মুগ্ধতাই সেখানে একমাত্র বিষয় ছিল না, বরং কবির শিক্ষাদর্শনের তাত্ত্বিক দিকের ব্যবহারিক প্রয়োজন সম্পর্কে একালের পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টান্তমূলক বিচার বিশ্লেষণই ছিল প্রধান। তার বক্তব্য বিষয় যা স্বভাবতই মনোযোগ দাবি করেছে। এখানে বিতর্কের বা ভিন্নমতের অবকাশ থাকলেও চিন্তাভাবনার খোরাকও ছিল। যেমন ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নীতিশ বিশ্বাসের ব্যতিক্রমধর্মী নিবন্ধটিতে, শিরোনাম 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় দলিত মানুষ'। মূলত জনশিক্ষাকে

সামনে রেখেই তার বক্তব্য, যা সময়াভাবে সংক্ষিপ্তসারে পড়েই শেষ করতে হয়েছে।

তবু বলতে হয় সব মিলিয়ে তিনদিনের এ সেমিনার একঘেয়ে বা ক্লান্তিকর হয়ে ওঠেনি, দু'একক্ষেত্রে ব্যতিক্রম সত্ত্বেও। সম্ভবত বিভিন্নমুখী ভাবনার প্রকাশ এর কারণ। সময়ের তুলনায় বক্তা ও বক্তব্যের সংখ্যা বেশি হয়ে ওঠার কারণে সবাইকে নিয়ে সারসংক্ষেপ করা বা ভবিষ্যৎ কর্মের সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে সমাপনী ভাষণে মৌখিক আশ্বাস মিলেছে প্রবন্ধগুলো প্রকাশের এবং মূল বিষয়ের দিকনির্দেশনাগত কর্মসূচি গ্রহণের। কতটা সম্ভব হবে বলা কঠিন। কারণ সরকারি তত্ত্বাবধানের কাজকর্ম নিয়ে এসব দেশে সমস্যা থাকে এবং তা ঐতিহ্যবাহী। এ অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য এনেছে যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অর্থাৎ প্রতিদিনই গান, নৃত্যনাট্য, নাটক বা নৃত্যের অনুষ্ঠানে মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারি পরিদর্শন। দেখার সুযোগ পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথের আঁকা কিছু ছবি এবং ঠাকুবাড়ির ধীমান চিত্রশিল্পী কারও কারও আঁকা ছবি—এ পরিবারের বিশিষ্টি ব্যক্তিদের তৈলচিত্র। বলা যায় শৈল্পিক চিত্ত-বিনোদনের সুযোগ লাভ। মিউজিয়ামের নতুন কিউরেটার ইন্দ্রানী ঘোষ—একটু পাহাড়ি ধাচের সপ্রতিভ চেহারা, হাসিখুশি মুখ। সম্প্রতি এসেছেন শান্তিনিকেতেন থেকে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিচর্চা ও চিত্রকলা সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ তার।

সত্যই গোটা অনুষ্ঠানের ভিন্নতর আকর্ষণ ছিল উদযশংকর হলে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য, ঠাকুরবাড়ির দোলা চত্বরে তোতাকাহিনী নাটক বা একক গৌড়ীয় নৃত্য। সব দিক বিচারে সরকারী পর্যায়ে হলেও গোটা অনুষ্ঠানটিকে তার তাৎক্ষণিক প্রকাশে নিঃসন্দেহে সফল বলা চলে। যেকোনও সেমিনার জাতীয় অনুষ্ঠানে বলাবাহুল্য তাৎক্ষণিক সফলতাই বড় কথা, অবশেষে ফলাফল অনেক দূরের বিষয়।

—oo—